মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন নারীরা

স্বাধীন রহমান

যুদ্ধের সময় বাঙালি নারীরা অনেক বড় সহায়ক শক্তি ছিল। পাকিস্তানিদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে রক্ষা ও উদ্ধার করার জন্য এ দেশের নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সব শ্রেণিপেশার মানুষ সম্মিলিতভাব মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তবে আজও তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান পাননি। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন এমন না জানা নারীরা হলেন কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, রওশন আরা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব নারী সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোবরা, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে। গোবরা ক্যাম্পে নারীদের দেওয়া হতো তিন রকম ট্রেনিং।

স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরিতে তৎকালীন নারীরা তাদের সব সামর্থ্য প্রয়োগ করেছিলেন। কেউ হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র, কেউ পাগল সেজে সাহায্য করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। কেউ আবার নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাদের। নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অথচ আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীর অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ক্ষেত্রে নিপীড়নের অগ্নিসাক্ষী বা লাঞ্ছিত-নিপীড়িত নারী নামেই প্রচার হয়েছে বেশি। আর এ কারণেই সম্ভবত রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরাও মঞ্চে উঠেই বলতে থাকেন, ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। সেই নারীরা যে শুধু সম্ভ্রম দিয়েছেন এমন নয়, প্রয়োজনে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে টেংরাটিলায় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিলে গুলিবিদ্ধ হন কাঁকন বিবি। 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত কাঁকন বিবি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ২৫ বছর পর বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবিকে ১৯৯৬ সালে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়।

মুক্তিবেটি কাকনবিবি

মাতৃপ্রধান খাসিয়া পরিবারে জন্ম কাঁকন হেনইঞ্চিতার। গর্ভে থাকা অবস্থাতেই তার বাবা আর মাত্র দেড় বছর বয়সে মা হারানো কাঁকন বড় হয়েছেন তার নানীর কাছে। নানী মারা যাওয়ার পর বড় হয়েছেন বড় বোনের কাছে। যিনি একজন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এক মুসলমান সীমান্ত রক্ষীকে বিয়ের পর মুসলমান হয়ে যান। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন কাঁকন, হয়ে যান কাঁকন বিবি। প্রথম স্বামীর ঘরে সন্তান বেঁচে না থাকায় কাঁকনকে তালাক দেন স্বামী। এরপর তার বিয়ে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আব্দুল মজিদ খানের সঙ্গে। বিয়ের পর কাঁকন হেনইঞ্চিতা এসে উঠলেন পাকিস্তানিদের বোগলা ক্যাম্পে। এই ঘরেও সন্তান মারা যেতে থাকলে স্বামী মজিদ খান সিলেটের আখালিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন কাঁকনকে পরিত্যাগ করেন। কাঁকন আবার একা হয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জুন মাসের দিকে স্বামীর খোঁজে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন কাঁকন। এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর চর সন্দেহে পাকিস্তানীরা কাঁকনকে আটক করে মুক্তি বাহিনীর গোপন তথ্য উদ্ধারের নামে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। পাকিস্তানি টেংরা ক্যাম্পে টানা সাত দিন ভয়ংকর নির্যাতন চলে কাঁকনের ওপর। এক পর্যায়ে পাক সেনারা তাকে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য বলে। সেখানে কাঁকনের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত নির্যাতন চলতো অন্য মেয়েদের উপরে। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীরা তাকে রাজি করিয়ে ফেলে তাদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করার জন্য। সুনামগঞ্জে দুঃসাহসী সব যুদ্ধে পরোক্ষভাবে তথ্য দিয়ে শামিল ছিলেন কাঁকন।

তারামন একটি তারা

তারামন বিবির আসল নাম ছিল তারাবানু। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তারামন রান্নার পাশাপাশি ধোয়ামোছা ও মাঝেমাঝে অস্ত্র সাফ করতেন। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ক্যাম্পে তাকে অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে, মুক্তিযোদ্ধা মুহিব হাবিলদার খানিকটা অবাক হন। কিন্তু তারামনের যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে রাইফেল চালানো শেখান তিনি। সম্মুখযুদ্ধ ছাড়াও গুপ্তচর সেজে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে ঢুকে তথ্য নিয়ে আসতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তারাবানু দারুণ অভিনয় করতে পারতেন। কখনো এমন হয়েছে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে ঢুকেছেন মাথায় চুলে জট লাগানো পাগলের বেশে, কখনো সারা

শরীরে কাদা লাগিয়ে, কখনো পঙ্গুর অভিনয় করে। পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে ঢুকে শুনতেন নানান গোপন তথ্য, ক্যাম্পের সবাই মনে করতো পাগল নয়তো মাথায় ছিটগ্রস্ত। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পরে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু এ খবরও জানতে পারেননি তারামন। ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া তারামন বিবির হাতে তুলে দেন বীর প্রতীক সম্মাননা।

গবেষক শাহনাজ পারভীনের তথ্য মতে, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণকে ১০টি অংশে ভাগ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধে নারীর এই বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি ও বিভাজনটি এরকম ১. সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে নারী; ২. আশ্রয়দাত্রী, অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারিণী হিসেবে নারী; ৩. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহকারিণী হিসেবে নারী; ৪. সেবা-শুশ্রুষার কাজে নিয়োজিত নারী; ৫. তথ্য সরবরাহ ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নারী; ৬. অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজে নিয়োজিত নারী; ৭. রাজনীতিক ও সংগঠক হিসেবে নারী; ৮. অনুপ্রেরণার উৎস রূপে নারী; ৯. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত নারী; ও ১০. শরণার্থীদের সাহায্য সহযোগিতায় বাঙালি ও প্রবাসী নারী।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পুরুষদের যখন আন্দোলন-সংগ্রামরত অবস্থায় জীবনকে তুচ্ছ করে হানাদারমুক্ত করতে লড়ে যেতে হয়েছে; ঠিক সেই সময় সংসার, সন্তান-সন্ততিসহ পরিবারের সবার দায়িত্বের ভার নারীদের নিতে হয়েছে। কলকাতার পার্ক সার্কাসের মাঝামাঝি গোবরা ও বিএলএফ ট্রেনিং ক্যাম্পে ৩০০ নারীকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, গীতা মজুমদার, ড. লাইলী পারভীন, গীতা কর, আলেয়া বেগম, শিরিন বানু মিতিল, রওশন আরা, আশালতা। এই ট্রেনিং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিনিধি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের গোবরা ক্যাম্পে দেওয়া হতো নারীদের প্রশিক্ষণ। সেই সময় দেওয়া হয়েছে সিভিল ডিফেন্স নার্সিং, অস্ত্র চালনা ও গেরিলা আক্রমণের তিনটি ট্রেনিং। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মরণকে সাদরে গ্রহণ করে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার প্রাণান্ত চেষ্টা কখনও বৃথা যাবে না। ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব নারী শহীদ হয়েছেন, বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন এবং যাদের নাম অগোচরে রয়ে গেছে; নাম না জানা সেই বীর নারীদের বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে জাতি। পৃথিবী যতদিন থাকবে, তাদের নাম স্মরণ করবে।

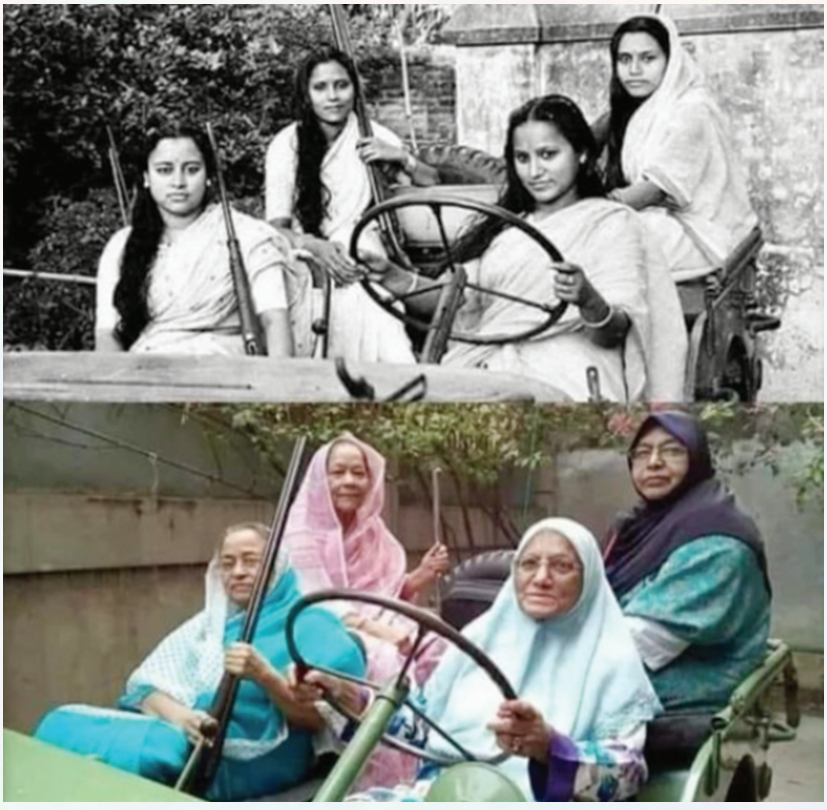

আবার অনেকেই অস্ত্র তুলে না নিয়ে বেছে নিয়েছিলেন শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমকে। যার প্রমাণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যারা বেতারে খবর পড়ে, কবিতা আবৃত্তি করে, গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও সমগ্র দেশবাসীকে উদ্দীপিত করেছিলেন, তাদের লড়াই ছিল অন্যরকম। শরণার্থী শিবিরের জন্য যারা অর্থ ও ত্রাণ সংগ্রহ করেছিলেন তাদেরকে এক ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সংগ্রামও অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিল। যে সমস্ত নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছিলেন, তাদের সংগ্রাম ছিল ভয়াবহতম। কেননা, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কষ্ট, নিঃসঙ্গতা এবং সামাজিক বহির্ভুক্তি শেষ হয়ে যায়নি। বছরের পর বছর তাদের এ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, এখনও হয়ত বা অনেকে নিরবে নিভৃতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন অনেকেই আছেন যাদের নিজের পরিবার তাদের উন্নয়ন কেন্দ্রে রেখে গেছেন। পরিবার আর তাদের ফিরিয়ে নিতে আসেননি। সে সব নারীদের চোখের পানি এক পর্যায়ে শুকিয়েও গেছে। দেশ এগিয়েছে, কিন্তু তাদের সেই ত্যাগ তার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়ে দিতে পারেনি এমন ত্যাগী নারীদের।